Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা হোসেন

রোলঃ 23090121748

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা হোসেন

রোলঃ 23090121748

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস? ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহিমা হোসেন, আইডিঃ 23090121748 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ফেমিনিজমের মুখোশ উন্মোচন: নারীর অধিকার নাকি পারিবারিক ধ্বংস? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফাহিমা হোসেন

আইডিঃ 23090121748

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা 5

১. পটভূমি 5

২. গবেষণার উদ্দেশ্য 6

৩. গবেষণার গুরুত্ব 7

৪.সীমা ও পরিধি 8

৫.গবেষণার প্রশ্ন 8

৬. গবেষণার পদ্ধতি 9

অধ্যায় ২:স্বাধীনতার ভ্রম 11

১.স্বাধীনতার ভ্রান্ত ধারণা 11

২. মানবসভ্যতায় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা 13

৩.মানসিক ও আবেগিক শৃঙ্খল 14

৪.নারীবাদের নিকট স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা 14

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত স্বাধীনতা 15

অধ্যায় ৩: ফেমিনিজমের ইতিহাস 17

১.খ্রিষ্টধর্মের বিকৃতি 17

২.ইউরোপে জুলুমের ইতিহাস ও নারীর অতিষ্ঠতা 18

৩.ইসলামের নারীদের ইতিহাস 19

অধ্যায় ৪: সমাজে ফেমিনিজমের প্রভাব 22

১.সামাজিক অশান্তি ও পারিবারিক সম্পর্কে বন্ধনহীনতা 22

২.অধিকার বনাম দায়িত্ব 24

৩.পুরুষ বনাম মহিলা: প্রতিযোগিতা নাকি পরিপূরকতা 25

অধ্যায় ৫: ইসলামের আলোকে নারী, পরিবার ও সমাজ 28

১.মানুষের সৃষ্টির নকশা 28

২.ইসলামের দৃষ্টিতে নারী..30

রেফারেন্স..32

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১. পটভূমি

'নারী'- একটি এমন বিষয় যা নিয়ে কথা বললেই চারপাশে যেন স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস হোক বা বর্তমান, সামান্য এদিক-ওদিক বললেই বিতর্ক, সমালোচনা, এমনকি সামাজিক তোলপাড় পর্যন্ত হতে পারে। তবে শুরুতেই স্পষ্ট করে বলা দরকার এই আলোচনা কোনো পক্ষকে ছোট বা বড় করার জন্য নয়; বরং নারী-পুরুষ উভয়ের মানবিক ও সামাজিক অবস্থানকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের একটি প্রচেষ্টা।

নারী সবসময় সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। তার উপস্থিতি, অধিকার, দায়িত্ব, স্বাধীনতা - সবকিছু নিয়েই যুগে যুগে প্রশ্ন উঠেছে, আন্দোলন হয়েছে, ভিন্ন মত এসেছে। সময়ের সাথে সাথে "ফেমিনিজম" নামের একটি শব্দ এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।আমিও একসময় নিজেকে একজন নারীবাদী ভেবেছি কিন্তু সেই নারীবাদ ছিল না কেবল পোশাক, শরীর বা বাহ্যিক স্বাধীনতার প্রতীক। বরং এমন এক চিন্তা যেখানে নারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। সমাজে সম্মান ও সমঅধিকার অর্জনের জন্য লড়বে। আমি বিশ্বাস করতাম, নারীবাদই সেই শক্তি, যা নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে পারবে।

কিন্তু বয়স এবং অভিজ্ঞতা যখন নিজের জায়গা তৈরি করল, তখন দেখলাম ফেমিনিজম নামের এই আন্দোলন তার ঘোষিত উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। নারীর আবেগ ও দুর্বলতাকে ব্যবহার করে তাকে এমন এক "স্বাধীনতা" দেওয়া হচ্ছে যার ভেতর আসলে হারিয়ে যাচ্ছে পরিবার, দায়িত্ব, নৈতিকতা আর জন্ম নিচ্ছে পুরুষবিদ্বেষ, অশালীনতা এবং সম্পর্ক ভাঙার সংস্কৃতি। তখন প্রশ্ন জাগে সত্যিকারের স্বাধীনতা কি শুধু "যা খুশি তাই করা"? নাকি সত্য স্বাধীনতা মানে নিজের মর্যাদা, নৈতিকতা ও আত্মসম্মান রক্ষা করা?

এই প্রশ্নগুলোই আমাকে ফিরিয়ে এনেছে সেই শিক্ষা ও মূল্যবোধের দিকে যা নারীকে ১৪০০ বছর আগে সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে, যখন পৃথিবীর অন্য কোথাও নারীকে মানুষ হিসেবেও বিবেচনা করা হতো না। ইসলাম নারীকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে এবং তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে।

ইসলাম বলে,

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।" (তিরমিজি)

"জান্নাত মায়ের পদতলে।" (নাসায়ি)

"নারীদের সঙ্গে সদয় আচরণ কর।" (আবু দাউদ)

১৪০০ বছর আগে ধূলিমলিন মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া একজন নিরক্ষর মানুষ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সম্মান নারীকে দিয়েছেন - আজকের তথাকথিত আধুনিক সমাজও সেই মর্যাদা দিতে ব্যর্থ।

তাহলে সমস্যা কোথায়?

ইসলামে? না মুসলমানদের আচরণে?

আমার কাছে উত্তর স্পষ্ট! ইসলামের শিক্ষা ব্যর্থ নয়, বরং ব্যর্থ হয়েছি আমরা। যারা এই শিক্ষাকে জানি না, মানি না, আর মানার চেষ্টা করতেও চাই না। ভুল করি আমরা, উদাসীন হই আমরা, অথচ দোষ দেই ধর্মকে।

ইসলাম এক নিখুঁত জীবনব্যবস্থা যা গঠিত মানুষের প্রফিটের জন্য। কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নয়; বরং গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্য। এখানেই প্রশান্তি। এখানেই সফলতা।

আল্লাহ বলেন,

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম... এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” (সূরা আল-মায়িদা ৫:৩)

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণা নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধুনিক নারীবাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলেও, এটি কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি, ধর্ম, জাতি বা সামাজিক পটভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গবেষণার লক্ষ্য হলো সমস্ত নারীকে, যেখানেই থাকুক, যেই ধর্মে থাকুক, যেই সমাজে থাকুক, তাদের জন্য ইসলামের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা। এটি কোনো বদ্ধগোষ্ঠীর আলোচনার জন্য নয়, বরং একটি মানবিক, নৈতিক এবং সমাজকল্যাণমূলক প্রয়াস।ফেমিনিজম নিয়ে আমি যেমন প্রশংসাও দেখেছি, তেমনি দেখেছি এর ভেতরের স্ববিরোধ, সংগ্রাম, আর বাস্তব জীবনে নারীর ওপর এর প্রভাব। অন্যদিকে ইসলাম ,যাকে অনেকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, তাতেও আমি খুঁজেছি নারী সম্পর্কিত মূল শিক্ষা, প্রকৃত অধিকার, এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য তাই দুটি দিককে সমানভাবে সামনে এনে দেখা-

- আধুনিক নারীবাদ যে স্বাধীনতা ও সমতার কথা বলে, তা বাস্তবে কতটা কার্যকর?
- ইসলামী দৃষ্টিকোণ নারীর অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা কতটা বাস্তবসম্মত, যুক্তিসঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ?

আমি চেষ্টা করেছি নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পূর্বধারণা বা সামাজিক চাপে নয়, বরং একটি নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলোকে দেখতে। আমার লেখার ভিত্তি অভিমান, ক্ষোভ বা অন্ধ-সমর্থন নয় - বরং প্রশ্ন করা, প্রমাণ খোঁজা, এবং সত্যকে চেনা।আর আশ্চর্যভাবে, যখন এই দুই ধারণাকে নিরপেক্ষভাবে তুলনা করেছি (নিজের অনুমান প্রমাণ করতে নয়, বরং সত্যটা খুঁজতে), তখন দেখেছি যে যেই পথটি সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, সবচেয়ে সম্মানজনক এবং নারীর প্রকৃতি, নিরাপত্তা, মানসিক শান্তি ও মানবিক মর্যাদার সাথে সবচেয়ে মিল রেখে দাঁড়িয়ে আছে - সেটি হলো ইসলামের পথ।

এটি আমার ‘বায়াসড’ সিদ্ধান্ত ছিল না; বরং unbiased analysis-এর ফল।আমি যেদিকেই তাকিয়েছি - ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, সমাজ, পরিবার, মূল্যবোধ - সবকিছুই আমাকে আস্তে আস্তে এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে:

সিরাতুল মুস্তাকীম - সেই সরল, সোজা, ভারসাম্যপূর্ণ পথ, যেখানে নারীকে সম্মানও দেওয়া হয়, অধিকারও দেওয়া হয়, আর পরিচয়ের মর্যাদাও রক্ষা করা হয়।

এই গবেষণা তাই কোনো মতবাদকে "জয়ী" বা "পরাজিত" প্রমাণের চেষ্টা নয়; বরং সত্যিকার কল্যাণ কোন পথ দেয় - সেই প্রশ্নের একটি সৎ, যুক্তিনির্ভর অনুসন্ধান।

৩. গবেষণার গুরুত্ব

আজকের সমাজে যে বিভ্রান্তি, টানাপড়েন ও ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে তার ভেতরে দাঁড়িয়ে সত্যিকার প্রশ্ন করার জন্যই এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।

ফেমিনিজম নিয়ে আজ অনেক আলোচনা হয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটি কী, এটি কাকে উপকার করছে, কারা এর শিকার হচ্ছে এবং এটি সমাজ ও পরিবারকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে - এসব প্রশ্ন নিয়ে খোলাখুলি, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ খুব কমই দেখা যায়। ফলে নারীবাদকে নিয়ে প্রচুর ভুল ধারণা, অতিরঞ্জন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়ে।

একইভাবে ইসলামের ক্ষেত্রেও আরেক ধরনের সংকট আছে। ইসলামে নারীর অধিকার যে কত গভীর, কত সম্মানজনক, কত ভারসাম্যপূর্ণ তা অনেক মুসলিম নারী-পুরুষই জানে না।ফলে সমাজে "ইসলাম নারীকে বঞ্চিত করে" এমন ভুল ধারণা খুব সহজে ছড়ায়। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানার আগেই অনেকেই সেটিকে বিচার করে ফেলে। আর এই দুই ভুল ধারণার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে - নারী নিজেই।স্বাধীনতার নামে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যা শেষমেশ নিয়ে যাচ্ছে -

- মানসিক চাপ
- একাকিত্ব
- পারিবারিক ভাঙন
- সম্পর্কের অস্থিতিশীলতা
- পরিচয়ের সংকট
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

তাই এই গবেষণার গুরুত্ব এখানেই যে এটি কোনো আদর্শিক যুদ্ধ নয়, বরং সত্যিকার কল্যাণ কার মাধ্যমে আসে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা।এই গবেষণা একটি শান্ত, নিরপেক্ষ জায়গা থেকে তুলে ধরতে চায়

- ফেমিনিজম আসলে কী বলে
- ইসলাম নারীর বিষয়ে কী বলে
- বাস্তব জীবনে কোন পথ নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা, সম্মান ও মানসিক স্থিতি সবচেয়ে ভালোভাবে নিশ্চিত করে

এটি শুধু তত্ত্ব নয় বরং মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তবতা, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে একটি প্রমাণভিত্তিক, যুক্তিনির্ভর, ও সৎ বিশ্লেষণ।

৪.সীমা ও পরিধি

এই গবেষণার আলোচনাটি খুব বিস্তৃত বা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দেওয়া নয়; বরং স্পষ্ট কিছু সীমানার ভেতরে সাজানো। নারী, ফেমিনিজম এবং ইসলাম - এই তিনটি বড় বিষয়কে কেন্দ্র করলেও, এখানে প্রতিটি তত্ত্ব বা আন্দোলনের সব দিক বিশ্লেষণ করা হবে না। গবেষণার পরিধি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে সেই দিকগুলোতে, যেগুলো সরাসরি নারীর বাস্তব জীবন, পরিবার, সম্পর্ক, মর্যাদা এবং মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে।

এই গবেষণা বিশেষ কোনো দেশ, শ্রেণি, ধর্ম বা পরিচয়ের নারীদের জন্য নয়; বরং বিশ্বের সব নারীকে কেন্দ্র করে, কারণ প্রশ্নগুলো সার্বজনীন:

স্বাধীনতা বলতে কী বুঝি?

কোন মূল্য দিয়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি?

এবং যেটা পেয়েছি, সেটি কি আদৌ আমাদের শান্তি দিয়েছে?

এই গবেষণায় তাই ফোকাস থাকবে-

- আধুনিক নারীবাদ যে স্বাধীনতা ও অধিকার দাবি করে, তার বাস্তব প্রয়োগ কতটা কার্যকর।
- ইসলামের নারী-সংক্রান্ত মূল শিক্ষা কী এবং তা কীভাবে নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য রক্ষা করে।
- পরিবার, সম্পর্ক এবং মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে উভয় দর্শনের প্রভাব।

এই পরিধির বাইরে থাকা বিষয় যেমন ফেমিনিজমের অতি-তাত্ত্বিক শাখা, বিশুদ্ধ রাজনৈতিক বিতর্ক, বা ইসলামী আইনের প্রতিটি সূক্ষ্ম ফিকহ্ - এসব এখানে বিশদে আলোচনা করা হবে না, কারণ গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো নারীর বাস্তব জীবন এবং তা প্রভাবিত করা দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা।এভাবে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে গবেষণাটি একদিকে পরিষ্কার, অন্যদিকে গভীর ও পাঠযোগ্য থাকে - ঠিক নারীর জীবনের মতো: বাস্তব, মানবিক এবং সম্পর্কমুখী।

৫.গবেষণার প্রশ্ন

এই গবেষণার ভেতরের প্রশ্নগুলো কোনো আনুষ্ঠানিক তালিকা নয়; বরং সেসব স্বাভাবিক, গভীর এবং কিছুটা যুক্তি-সংশয়মিশ্রিত প্রশ্ন যা আজকের সময়ের প্রায় প্রতিটি নারীই কোনো না কোনো মুহূর্তে নিজের ভেতরে অনুভব করে। আধুনিকতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, “নিজেকে বেছে নেওয়া”, “নিজেকে আগে রাখা” - এসব কথার ভিড়ে দাঁড়িয়ে আমরা সত্যিই কী পেয়েছি, আর কী হারিয়েছি -সেই জায়গা থেকেই প্রশ্নগুলো জন্ম নেয়।

ফেমিনিজম আমাদের যে অধিকার, স্বাধীনতা ও সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে- সেগুলো কতটা বাস্তব, আর কতটা শুধু তাত্ত্বিক? এই পথ ধরে হাঁটতে গিয়ে আসলেই কি আমাদের জীবন

সহজ, নিরাপদ ও পরিপূর্ণ হয়েছে- নাকি ধীরে ধীরে আমরা এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছেছি যেখানে সবকিছুই যেন "অপূর্ণ", "অপেক্ষমান", "যথেষ্ট নয়"?

এই গবেষণা তাই জানতে চায়-

যে স্বপ্ন আমাদের দেখানো হয়েছিল, তার মূল্য আমরা কতটা বেশি দিয়ে দিয়েছি?

কেন সেই "উন্নত জীবন" খুঁজতে গিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আরও বেশি ফাঁপাভাব, সম্পর্কের ভাঙন, একাকিত্ব এবং চাপ অনুভব করি?

এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ - এই পথের প্রতিশ্রুতিগুলোর কতগুলো সত্যিই পূর্ণ হয়েছে?

অন্যদিকে, ইসলামের যে পথ (যা বহু নারী জানেই না, বা জানলেও ভুলভাবে শুনেছে) সেই পথ কি প্রকৃত সম্মান, নিরাপত্তা ও মানসিক ভারসাম্যের জায়গা দিতে পারে? ইসলামের শিক্ষা কি শুধু আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নাকি এতে নারীর সম্পূর্ণ সত্তার জন্য কোনো গভীর, বাস্তবসম্মত পথনির্দেশ আছে?

এ গবেষণা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজে কোনো একদিককে জেতানোর জন্য নয়; বরং কোন পথ নারীর শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তাকে সবচেয়ে সৎভাবে ধরে রাখে- সেটি বুঝতে।

এগুলোই সেই প্রশ্ন, যা এই গবেষণাকে চালিত করে।

একদিকে অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে যুক্তি;

একদিকে বাস্তবতা, অন্যদিকে বিবেক;

আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নারী নিজে, তার ভয়, তার আশা, তার ক্লান্তি, তার শক্তি - সবকিছুর সঙ্গে।

৬. গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণার পথচলা খুব সরল বা একরেখা নয়। এটি সেই ধরনের অনুসন্ধান যেখানে তথ্য, অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, ধর্মীয় শিক্ষা - সবকিছুকে একসঙ্গে বসিয়ে দেখতে হয়, কোন দৃষ্টিভঙ্গিটি সত্যিকারের কল্যাণ দেয় আর কোনটি শুধু প্রতিশ্রুতির ঝলকানিতে আটকে থাকে। তাই গবেষণার পদ্ধতি রাখা হয়েছে তুলনামূলক, প্রতিফলনমূলক এবং বাস্তবতানির্ভর।

প্রথমত, ইসলামের নারী-সংক্রান্ত শিক্ষাকে বোঝার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কুরআন ও সহিহ হাদিস- যেখানে নারীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ ও রসূল ﷺ-এর প্রত্যক্ষ বক্তব্য রয়েছে। এই অংশে লক্ষ্য ছিল কোনো ধর্মীয় আবেগ বা ব্যক্তিগত ব্যাখা চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং ইসলামের মূল শিক্ষা আসলে কী বলে, তা স্পষ্টভাবে দেখা।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক নারীবাদ পরীক্ষা করা হয়েছে সমসাময়িক গবেষণা, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এবং বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে। নারীবাদ কী দাবি করে, সমাজে এর প্রভাব কী, এবং নারীর জীবনে এর বাস্তব ফলাফল কী - এসব আলোচনাই এই অংশের কেন্দ্রবিন্দু।

তৃতীয়ত, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশাপাশি রেখে করা হয়েছে comparative analysis অর্থাৎ তুলনা। কোন পথ নারীর মানসিক শান্তি, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সামাজিক ভারসাম্যকে ভালোভাবে ধরে রাখতে পারে, সেটি নির্ধারণ করা হয়েছে যুক্তি, প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

এইভাবে পদ্ধতি সাজানো হয়েছে -

যাতে গবেষণা শুধুই তত্ত্বের স্তূপ না হয়ে, এক জীবন্ত আলোচনায় পরিণত হয়;

যেখানে নারী নিজেকে খুঁজে পেতে পারে - যথেষ্ট, সম্মানিত, ও নিরাপদ।

অধ্যায় ২:স্বাধীনতার ভ্রম

১.স্বাধীনতার ভ্রান্ত ধারণা

আলোচনার শুরুতেই একটি ছোট অনুরোধ! এই মুহূর্তে 'নারী' শব্দটি মন থেকে সরিয়ে রাখুন। কারণ পরবর্তী অংশটি কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে নয়; বরং এটি এক ধরনের মানসিক বদল, একটি paradigm shift যেখানে আমরা "স্বাধীনতা" শব্দটিকে নতুন করে দেখব, পক্ষপাত ছাড়াই। চলুন একসাথে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক, কোনো পূর্বধারণা বা লিঙ্গভিত্তিক ফিল্টার ছাড়াই।

'স্বাধীনতা'- একটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু একই সাথে বিভ্রান্তিকর শব্দ। আজ প্রায় সবাই বলে, "আমি একজন স্বাধীন ব্যক্তি।" কিন্তু প্রশ্ন হলো: আমরা কি সত্যিই স্বাধীন? স্বাধীনতার 'স্ব' - নিজস্বতা- আসলেই কোথায়?আমাদের ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত, মতামত - এসব কতটা আমাদের নিজের, আর কতটাই বা সমাজ, মিডিয়া, ট্রেন্ড, বাজারব্যবস্থা ও ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর তৈরি মানদণ্ডের ফল?

আসেন কিছু বাস্তব জীবনের দৃশ্য দেখে নেই:

১) ট্রেন্ড-চালিত সিদ্ধান্ত : আমরা ভাবি, "আমি তো নিজের পছন্দে পোশাক পরি"। কিন্তু সত্যি কি তাই? নিজের পছন্দ সত্যি হলে, সমাজের গড়ে তোলা জনপ্রিয় পোশাকের ধারা থেকে একটু বের হলেই কেন এত কথা শুনতে হয়? ধরুন, আপনি একটু ঢিলেঢালা, শালীন পোশাক পরলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কারও কানাকানি "খ্যাত!","পুরনো ফ্যাশন!", চুপিসারে হাসাহাসি, চোখ-মুখ কুচকে তাকানো যেন আপনার পোশাক অপরাধ।কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যে পোশাককে আজ "ওল্ড ফ্যাশন" বলা হচ্ছে, এক সময় সেটাই ছিলো সমাজের স্বাভাবিক রীতি।ট্রেন্ড বদলালেই পোশাকের ধরন থেকে শুরু করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায়।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এটা কি সত্যিই আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত?

নাকি পুরোটা ফ্যাশন শিল্পই ঠিক করে দিচ্ছে?

আমরা কী পরব, কোন পোশাক কে 'এক্সেপ্টেবল' বলব, আর কাকে 'আনএক্সেপ্টেবল' বলে হাসব?

২) সোশ্যাল মিডিয়া-চালিত মতামত: অনেকেই ভাবে "আমি তো আমার মতামত নিজে গঠন করি"। কিন্তু একবার Twitter/ Instagram/ TikTok- এর "popular opinion" বদলে গেলে, হঠাৎই যা গতকাল 'স্বাভাবিক' ছিল, আজ সেটা 'problematic' হয়ে যায়।মানুষ নিজের মত বদলায় না, তার মত বদলায় তাকে ঘিরে থাকা পরিবেশ।

৩) ভোগবাদী চাহিদা: অনেক সময় আমাদের মনে হয়,"আমি এই জিনিসটা চাই"। কিন্তু আমরা কখনও কি ভেবে দেখেছি, আমরা কি সত্যিই চাই? নাকি বিজ্ঞাপন, influencer, lifestyle content আমাদের সেই চাহিদা তৈরি করেছে? উদাহরণ:একটি ফোন একদম ভালো কাজ

করছে, কিন্তু নতুন model বের হওয়া মাত্রই পুরনোটা outdated লাগে।কে সিদ্ধান্ত নিল - আপনি? নাকি বাজার?

৪) সম্পর্ক ও জীবনধারা নিয়ে বিভ্রান্তি: আধুনিক মিডিয়া খুব চতুরভাবেই বলে- "বিয়ে মানেই ফাঁদ", "বিয়ে করলে জীবন ছোট হয়ে যায়"। বারবার শুনতে শুনতে অনেকেই ভাবতে শুরু করে, ' হ্যাঁ, এটা তো আমার নিজেরও মত'। কিন্তু সত্যি বলতে এগুলো আমাদের নিজের ভাবনা নয়; এগুলো তৈরি করা সাংস্কৃতিক বর্ণনা যা প্রতিদিন খুব সূক্ষ্মভাবে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় -ভিডিও, গান, সিরিজ, সিনেমা, ইন্সটাগ্রাম পোস্ট - সবকিছু মিলিয়ে।ফলে ধীরে ধীরে মানুষের ইচ্ছা আর নিজের থাকে না। নিজেরা কী চাই তা ভুলে গিয়ে, জনপ্রিয় সংস্কৃতি যা চাইতে বলে - সেটাই 'স্বাধীনতা' বলে মনে হয়।

গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় আজকের স্বাধীনতা অনেকটাই "দেখতে স্বাধীনতা", অনুভবে নয়।

ওরওয়েল তার *1984*-এ লিখেছিলেন, "Freedom is the freedom to say that two plus two make four."

অর্থাৎ আপনি স্বাধীন, যতক্ষণ আপনার সত্য - তাদের সত্যের সাথে মিলে যায়। এখানে 'তারা' বলতে সমাজ, এলিট, সেলিব্রেটি, ট্রেন্ড-নির্ধারক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্ট্রাকচার - যারা নীরবে ঠিক করে দেয় কী 'স্বাধীনতা' হিসেবে গণ্য হবে। আপনি যতক্ষণ তাদের সেই "নীরব নিয়ম" মেনে চলছেন, ততক্ষণ আপনি স্বাধীন।

কিন্তু আপনি যদি প্রশ্ন করেন- স্বাধীনতার দাবি হঠাৎই সংকুচিত হয়ে যায়।

রুশো বহু আগেই বলেছিলেন, "Man is born free but everywhere he is in chains." আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক **ফুকো** ও **আলথুসার** এই সমস্যার গভীর ব্যাখ্যা দেন। তাদের মতে সমাজ, স্কুল, মিডিয়া, সিনেমা, ফ্যাশন, বিজ্ঞাপন- সব মিলিয়ে এমন এক অদৃশ্য কাঠামো তৈরি করে, যেখানে মানুষ ভাবে সে নিজের সিদ্ধান্তে চলছে, কিন্তু বাস্তবে সে ক্ষমতাবান কাঠামোর ছাঁচে তৈরিকৃত ইচ্ছা পূরণ করছে। এই সব দৃষ্টিকোণ মিলিয়ে একটাই ছবি স্পষ্ট-

স্বাধীনতার নামে যে "মুক্তি" আমাদের দেখানো হয়

তা আসলে এক গভীর মানসিক ও সামাজিক ছলনা।স্বাধীনতা আজ-

- ভোগবাদীর তৈরি পথ
- সমাজের চাপানো মাপকাঠি
- মিডিয়া-গঠিত আকাঙ্ক্ষা
- জনপ্রিয়তার অদৃশ্য কারাগার

আজকের এই শৃঙ্খল আর লোহার নয়- এগুলো মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। একই শৃঙ্খল নারীকে বেঁধে রাখে, একই শৃঙ্খল পুরুষকেও। পথটা আলাদা কিন্তু বদ্ধতা একই।কেউ বলে দেয় কীভাবে পোশাক পরতে হবে,কেউ বলে কীভাবে ভাবতে হবে,কেউ বলে কোন পথ "সঠিক", কোন জীবন "মডার্ন"।আমরা ভাবি আমরা স্বাধীন, আসলে আমরা শুধু সেই অদৃশ্য

মানদণ্ডগুলো অনুসরণ করছি। এই কারণেই স্বাধীনতা আজ অনেকাংশেই একটি ভ্রম- একটি শব্দ, যার ভেতরে মুক্তির চেয়ে নিয়ন্ত্রণই বেশি এবং এই ভ্রান্ত ধারণা নারী ও পুরুষ- উভয়েরই ক্ষতি করছে।ব্যথার ধরন আলাদা হলেও, বাঁধনটা এক।

২. মানবসভ্যতায় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা

মানবসভ্যতা জন্ম থেকেই স্বাধীনতার ওপর নানা স্তরের সীমা আর শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে।এগুলো সবসময় খারাপ নয়। বড় প্রশ্ন হলো: এই সীমাবদ্ধতাগুলো আমরা নিজেরা তৈরি করেছি, নাকি এগুলো আমাদের ওপর চাপানো হয়েছে? আরো বড় প্রশ্ন - এটিই কি স্বাধীনতার স্বাভাবিক রূপ, নাকি আমরা যে 'মুক্তি' ভাবি তারই ভুল ব্যাখ্যা? চলুন ধীরে ধীরে দেখি।

প্রকৃতির আরোপ করা সীমাবদ্ধতা (মানুষের প্রথম শিক্ষক):মানবসভ্যতার প্রথম সীমা মানুষ নিজেই অনুভব করেছে প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে। **মানুষ চাইলে আগুন ধরাতে পারে, কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রিত না হলে সেই আগুন তাকে পুড়িয়ে দিতে পারে**। প্রকৃতি মানুষের কাছে প্রথম শিক্ষা দিয়েছে যে সীমাহীন স্বাধীনতা অস্তিত্বের বিরোধী।মুক্তিও তখন পর্যন্তই সম্ভব, যতক্ষণ তা প্রকৃতির সীমানাকে সম্মান করে।

সমাজের আরোপ করা সীমা (নিরাপত্তার বদলে নিয়ন্ত্রণ): ইতিহাসের যেকোনো সমাজ দেখলেই বোঝা যায় যে সমাজ কখনোই "সীমাহীন স্বাধীনতা" মেনে নেয়নি।কারণ সমাজ জানে যে একজন মানুষের সীমাহীন স্বাধীনতা মানে আরেকজনের সীমাহীন ক্ষতি।এই কারণে আইন, নিয়ম, নীতি তৈরি হয়।কিন্তু সমস্যা হলো, সমাজ ধীরে ধীরে নিরাপত্তার জন্য তৈরি নিয়মকে নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রে পরিণত করে। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীসে "freedom" বলতে বোঝানো হতো, "সামাজিক অনুমোদনের ভেতরে বাঁচা"।আর ইসলাম এটিকে সংশোধন করে বলেছে মানুষের স্বাধীনতা মানুষের খেয়াল বা সমাজের মাপে নয়; স্রষ্টার ন্যায়ের কাঠামোর ভেতরেই তার প্রকৃত মর্যাদা।এটি মুক্তি কেড়ে নেয় না; বরং সমাজের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেয়।

ইতিহাসের শিক্ষা (সীমাহীন স্বাধীনতা কখনো টেকেনি): মানুষ যতই স্বাধীনতার কথা বলুক, ইতিহাস সাক্ষী যে সীমাহীন স্বাধীনতা কখনো কোনো সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের একটি বড় কারণ ছিল স্বাধীনতার নামে সীমাহীন ভোগবাদ।গ্রিক সভ্যতাও একই জিনিসের কারণে দুর্বল হয়।ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্বোচ্চ মূল্য পেলেও সমষ্টিগত দায়িত্ব হারিয়ে যায়।

অথচ ইসলামের সীমা আমাদের দেখিয়ে দেয় নিরাপত্তার সুঠাম ব্যবস্থা। উদাহরণ হিসেবে খলিফা উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ) উল্লেখ করা যায়। তিনি জনগণকে ন্যায়বিচার ও মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু সেটা তাঁর ব্যক্তিগত উদারতা থেকে নয়; বরং আল্লাহর বিধান মেনে চলার কারণে। তার শাসনামলে মুসলিম ও অ-মুসলিম সবাই নিরাপদ এবং তাদের অধিকার রক্ষা পেয়েছিল। উমর (রাঃ) বলেছিলেন-

"যদি মানুষ আমাকে পথের ওপর খোঁচা দেয়, তবু আমার কোনো অধিকার নেই অন্যায় করার। আমার কর্তৃত্ব আল্লাহর আইন মানার মধ্যেই।"(বালাধুরি, ফুতূহ আল-বুলদান)

মানবসভ্যতা সবসময় মানুষের স্বাধীনতার ওপর সীমা বসিয়েছে- কখনো প্রয়োজনের জন্য, কখনো নিরাপত্তার জন্য আর অনেক সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য।কিন্তু ইসলাম সেই সীমাকে বদলে দিয়েছে মানুষের ক্ষতি রোধে, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এবং মানুষকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনতে।এই কারণেই মানবসভ্যতা যেখানেই সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়ে ভেঙে পড়েছে, ইসলাম সেখানে স্বাধীনতার একটি ভারসাম্যপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ, মানবিক রূপ দেখিয়েছে।

৩.মানসিক ও আবেগিক শৃঙ্খল

চিন্তা করুন, আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বসেছেন - জীবনের বড় সিদ্ধান্ত। মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা আপনারই, কিন্তু ভাবুন তো! কি ধরণের আবেগ, প্রভাব, অভ্যাস আপনার ভিতরে চুপিসারে কাজ করছে। হঠাৎ দেখবেন আমাদের চেতনা অনেকটাই অচেতন মানসিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমরা যা কিছু চাই এবং মনে করি নিজের ইচ্ছা, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটা প্রায়ই হয় "সাব-সচেতন প্রভাব" অর্থাৎ ছোটবেলা থেকে শেখা অভ্যাস, মিডিয়ার বার্তা, সামাজিক প্রত্যাশা, প্রিয়জনের চাওয়া সব মিলে আমাদের ইচ্ছাকে গঠন করে। তাই যখন আমরা ভাবি, "আমি চাই এটা, আমি চাই ওটা", অনেক সময় আমরা সত্যি তা চাই না বরং আমাদের ইচ্ছাটাই অন্যের তৈরি। এই মানসিক বন্দিত্ব শুধু সামাজিক বা মিডিয়া-সম্পর্কিত নয়। ভোগ, মোহ, লোভ, অভ্যাস - সবই এক ধরনের অদৃশ্য শৃঙ্খল। আমরা যখন আনন্দ খুঁজতে পাই না, তখনও মনে করি আমরা বাকি যাদের মতো স্বাধীন। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নিজের আবেগকে বোঝার, নিয়ন্ত্রণ করার এবং সঠিক দিশা দেওয়ার ক্ষমতা থেকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই শৃঙ্খলকে আরও গভীরভাবে বোঝা যায়। আমাদের হৃদয়, আবেগ এবং ইচ্ছার ওপরই স্রষ্টা সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

"আর যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে, সে-ই এমন এক মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরেছে, যা কখনোই ভেঙে যাওয়ার নয়। আর সমস্ত কর্মের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই কাছে।" ~ সুরা লুকমান(৩১:২২)

যে ব্যক্তি নিজের আবেগ ও ইচ্ছাকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে কোনো বাহ্যিক জোয়ারের প্রভাবেই দাস হয় না। প্রকৃত স্বাধীনতা তখন আসে, যখন মানুষ অভ্যাস, আবেগ ও আবেগপ্রবণতা থেকে জন্ম নেওয়া শৃঙ্খলগুলোকে চেনে, বোঝে এবং তাদের উপর দায়িত্বশীলভাবে কাজ করে।

৪.নারীবাদের নিকট স্বাধীনতার ভুল ব্যখ্যা

নারীবাদীরা নিজেদের যে দৃঢ় ও স্বনির্ভর চেহারা তুলে ধরে, বাস্তবে সেটার ভেতরে অনেক ভাঙন লুকিয়ে থাকে।ইউরোপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারী অবমাননা, বৈষম্য, যৌন

নিপীড়ন ও বস্তুকরণের ইতিহাস বহন করেছে("ফেমিনিজমের ইতিহাস" অধ্যায়ে আমরা তা বিস্তারিত দেখব)। তাই স্বাধীনতার জন্য তাদের আহ্বান ছিল ন্যায্য, স্বাভাবিক ও বহুল প্রত্যাশিত।

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই ন্যায্য কান্নাকেও আবার শোষণ করেছে অন্য এক ক্ষমতাকাঠামো: পুঁজিবাদ।নারীকে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, সেটি বাস্তবে কখনোই পুরোপুরি পূরণ করা হয়নি। যে সমতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা কাগজে আছে, বাস্তবে নয়।যে অধিকারের জন্য তারা লড়েছিল আজও তা আলোচনার টেবিলে।ইতিহাসে নারীদের নিয়ে যে তামাশা করা হয়েছে, একই তামাশা আজ নতুন পোশাকে আবার ফিরেছে। আগে ছিল লোহার বেড়ি, এখন সোনার। কিন্তু বেড়ি তো বেড়িই - রূপ বদলালেই মুক্তি আসে না। বাঁধন বদলেছে, মুক্তি নয়।ইসলাম এই বেড়িবাঁধ ভেঙে দেয়।নারীকে সাজানোর পণ্য বানিয়ে উচ্চ আসনে বসিয়ে তারপর ব্যবহার করে না; বরং তাকে মানুষ হিসেবে, নারী হিসেবে, আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে একটি সম্মানিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে যেখানে তার দেহ নয়, তার ব্যক্তিত্ব মূল্য পায়।ইসলাম তাকে বস্তু থেকে উত্তোলন করে, মর্যাদার আসনে বসায়।

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত স্বাধীনতা

ইসলাম স্বাধীনতাকে সমাজের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখে না। ইসলামের কাছে স্বাধীনতা মানে ইচ্ছেমতো চলা নয়; বরং নিজেকে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বাঁচানো, নিজের ক্ষতি এড়ানো, এবং এমন এক জীবন তৈরি করা যেখানে মানুষ নিজেরই দাস না হয়ে আল্লাহর নির্দেশে নিরাপদ থাকে।

ইসলাম যখন বলে, “মানুষ স্বাধীন,” তখন সেটার মানে হলো তাকে কেউ পণ্য বানানোর অধিকার রাখে না, তাকে ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই,তার সম্মান, তার দেহ, তার চিন্তা- সবকিছুই সংরক্ষিত, নিরাপদ।

এটা শৃঙ্খল নয়।এটা এক ধরনের সুরক্ষা যার ভেতরে মানুষ নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে।কুরআনে আল্লাহ বলেন,

“যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো, সে-ই সফল হলো। আর যে তা কলুষিত করলো, সে-ই ব্যর্থ।”(সূরা আশ-শামস :৯-১০)

এটা খুব পরিষ্কার ভাষায় বলে যে, মানুষের সবচেয়ে বড় দাসত্ব -কোনো রাষ্ট্র, সমাজ বা মানুষের দাসত্ব নয়।সবচেয়ে বড় দাসত্ব হলো নিজের নফস, নিজের আবেগ, নিজের হাওয়া।যেখানে মানুষ মনে করে "আমি যা চাই তাই করব" সেখানেই সে অনেক সময় নিজের ইচ্ছার ক্যাপটিভ হয়ে যায়।ইসলাম প্রথমে এই অভ্যন্তরীণ দাসত্বটাই ভেঙে দেয়।ইসলামের স্বাধীনতা হলো এমন যেখানে মানুষ যেন নিজের ক্ষতি না করে,নিজের মর্যাদা না হারায় আর ভুল স্বাধীনতার নামে নতুন শৃঙ্খলে না বাঁধা পড়ে। ইসলাম নারীর জন্য স্বাধীনতা মানে গলায় মালা ঝুলিয়ে আদর্শ "আইকন" বানিয়ে ফেলা নয় বা তাকে "গ্ল্যামারের বাজারে" সাজিয়ে রাখা

নয়।ইসলাম বলে, তুমি নারী হিসেবে যথেষ্ট।তোমার সম্মান তোমার দেহে নয়, তোমার সত্তায়।তোমার মর্যাদা তোমার পোশাকে নয়, তোমার ভিতরের তাকওয়ায়।

ইসলাম পুরুষের মতো নারীকেও দেয়- উত্তরাধিকার, সম্পদ, শিক্ষা, পছন্দ, নিরাপত্তা - কিন্তু এই স্বাধীনতা এমনভাবে দেয় যে নারীকে কখনো ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে নামিয়ে আনে না আবার তাকে দায়িত্বহীন স্বাধীনতার নামে হারিয়ে ফেলতেও দেয় না।ইসলামের স্বাধীনতা সহজ ভাষায় এটাই মানুষ যেন মানুষের দাস না হয়। মানুষ যেন নিজের নফসের দাসও না হয়। মানুষ যেন শুধু আল্লাহর দাস হয়।

আর একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো যেখানে দাসত্বের শব্দটা অন্য সিস্টেমে অপমানের,ইসলামে এই দাসত্বই মানুষকে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও মুক্ত করে।কি সুন্দর না!

অধ্যায় ৩: ফেমিনিজমের ইতিহাস

১.খ্রিষ্টধর্মের বিকৃতি

মধ্যযুগের সময়কাল। এমন একটি সময় যখন মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম তার স্বর্ণযুগে পৌঁছেছে - শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ন্যায় ও সভ্যতার ক্ষেত্রে অতুলনীয় সাফল্য। আর ইউরোপ? ইউরোপ তখন নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ এবং অশিক্ষার কারণে ধ্বংসস্তূপের মতো অবস্থায় ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, ধর্মীয় বিভাজন আর ধর্মনিরপেক্ষ জুলুম - এটাই ছিল ইউরোপের বাস্তবতা।

ইউরোপের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের সম্পর্ক বহু শতাব্দীর গভীর। তাই ইউরোপের জন্য ধর্ম মানে খ্রিষ্টধর্ম আর মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ইসলাম। কিন্তু দুই অঞ্চলের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা একেবারেই বিপরীত।

খ্রিষ্টধর্ম মূলত বনী ইসরাইলের জন্য প্রেরিত হয়েছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন,
"আমাকে বনী ইসরাইলের জন্য পাঠানো হয়েছে।" (মথি ১৫:২৪)

কিন্তু ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে যখন একজন ইহুদি পণ্ডিত Saul, যিনি পরে নিজেকে **Paul** নামে পরিচিত করেন, দাবি করেন যে তিনি ঈসা আলাইহিস সালামকে স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নে ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে নির্দেশ দেন খ্রিষ্টধর্মকে ইহুদির বাইরে বিস্তৃত করতে। যা ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত রিসালাতের বিপরীত। Paul নিজেকে 'অ-ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত' ঘোষণা করলেন আর Peter (ঈসা আলাইহিসসালামের শিষ্য) থেকে যান 'ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত হিসেবেই। ফলে খ্রিষ্টধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

Peter-এর অনুসারীরা ঈসা আলাইহিস সালামের আসল শিক্ষার ওপর অটল থাকে আর Paul এর নতুন ধর্মটি (পরবর্তীকালে মূলধারার খ্রিষ্টধর্ম) মৌলিক বিধিনিষেধ অনেকটাই পরিবর্তন করে। তারা বলে: খতনা (circumcision) অপরিহার্য নয়, মদ্যপান অনুমোদনযোগ্য, শনিবার পালন জরুরি নয়, শূকর-মাংস খাওয়া যায় এবং আরো অনেক কিছু। এছাড়াও রোমান মুশরিক সংস্কৃতি মিশে যায়। উদাহরণস্বরূপ: ২৫ ডিসেম্বরকে যীশুর জন্মদিন হিসেবে উদযাপন করা (মূলত সান গড অ্যাপোলোর জন্মদিন), ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে ঘোষণা করা (নাউযুবিল্লাহ), মূর্তি তৈরি করা, রবিবারকে পূজার দিন হিসেবে পালন করা(SUNday) ইত্যাদি।

ফলস্বরূপ, খ্রিষ্টধর্মের মূল যৌক্তিকতা, ন্যায় এবং মানুষের কল্যাণের লক্ষ্য হারিয়ে যায়। ইউরোপে যা ছড়িয়ে পড়ে তা এক ধরনের ধর্ম যা যুক্তি, ন্যায় এবং মানুষের কল্যাণের বদলে বিভ্রান্তি, সামাজিক নিয়ম এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবকে কেন্দ্র করে। আজকের দৃষ্টিতে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম তখন মানুষের কল্যাণ, ন্যায়, শিক্ষা, এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার উপর ভিত্তি করে সমাজকে এগিয়ে নিচ্ছিল, আর ইউরোপের খ্রিষ্টধর্ম - যা কখনো যুক্তি, ন্যায় ও মানবকল্যাণের পথে- বিপরীতভাবে বিকৃত হয়ে মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিচ্ছিল।

পরবর্তী অংশে আমরা দেখব, এই বিকৃত খ্রিষ্টধর্ম কিভাবে ইউরোপে অমানবিকতা, জুলুম এবং নারীর উপর অন্যান্য নিপীড়নকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

২.ইউরোপে জুলুমের ইতিহাস ও নারীর অতিষ্ঠতা

মধ্যযুগ ইউরোপে যখন রোমান চার্চ পুরো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল, তখন সেই শক্তি হয়ে উঠে বর্বর ও নির্মম। সেই পরিবেশে খ্রিস্টধর্মের রূপ রোমান চার্চের মাধ্যমে এমনভাবে বিকৃত ও রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল যে এর প্রভাব শুধু ধর্মীয় জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং অর্থনীতি, সমাজ এবং নারীর উপরেও গভীর ক্ষতি করল।

মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চ বিশ্বের সবচেয়ে বড় জমিদার প্রতিষ্ঠান ছিল(Weebly, 2024)। প্রতি বছর সাধারণ মানুষ তাদের কৃষি উৎপাদনের প্রায় ১০% **"Tithe"** হিসেবে চার্চকে দিত। দিতে পারলে ভালো, না পারলে শাস্তি - এভাবে চার্চ সম্পদ সংগ্রহ করে রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।চার্চ শুধু ধর্মীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখেনি, বরং এই অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে মানুষের জীবন, সমাজ এবং চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

মধ্যযুগ থেকে প্রথম আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইউরোপে **Witch Hunting** একটি ভয়াবহ বাস্তবতা ছিল। এই অভিযানে অভিযুক্ত নারীরা প্রায়ই অমানবিক অত্যাচার ও ফাঁসির শিকার হতেন। উইচ-হান্টিং-এর সময় অনেক নারী ধর্ষণ, অত্যাচার এবং অমানবিক বিচারে মারা গিয়েছিল। এক বিশ্লেষণ বলেছে, ১৫–১৮ শতকে প্রায় ৪০,০০০–৬০,০০০ লোক "witchcraft"-এর অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড পায়, অধিকাংশই নারী।। ইতিহাসবিদদের মতে, এক্ষেত্রে শুধু অন্ধ বিশ্বাস বা ধর্মীয় অনুগমনই নয় - এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবও ছিল। (De Gruyter, 2020)। উদাহরণস্বরূপ, **Würzburg**-এ *১৬২৫–১৬৩১* সালের Witch Trial-এ শতাধিক মহিলা (সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিশু পর্যন্ত) নির্বিচারে অভিযুক্ত ও ফাঁস দেওয়া হয়েছিল।

রোমান স্টোয়িক ধারণা অনুযায়ী, আদর্শ মানুষ অনুভূতি ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে; কিন্তু চার্চ এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এই আদর্শকে অপব্যবহার করেছে। তারা সেই "আবেগীয় নিয়ন্ত্রণ" বা ভয় ব্যবহার করেছিল, বিশেষ করে নারীদের বিরুদ্ধে, তাদের বিচ্যুতি ও ভিন্নমতকে "অভিশাপিত" হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। মধ্যযুগের এই ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই, নারীর ওপর ধর্মীয় ও সামাজিক দমন কেবল আধ্যাত্মিক কল্পনা নয়; এটি বাস্তব শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের এক জটিল নেটওয়ার্ক।

এই ক্রমাগত পরীক্ষণ, অবহেলা, এবং সমাজের অদৃশ্য বাঁধনগুলো নারীদের বাধ্য করেছিল নিজের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে। তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে, এমনকি যখন 'সাহায্য' দেওয়ার অঙ্গীকার শুধুই খালি শব্দে সীমাবদ্ধ ছিল।

৩.ইসলামের নারীদের ইতিহাস

পশ্চিমা নারীদের ইতিহাস যতই ব্যথাভারাক্রান্ত হোক, যত অত্যাচারই তারা সহ্য করুক একটা জিনিস অস্বীকার করা যায় না: **ফেমিনিজম পশ্চিমের বাস্তবতার সন্তান**। খ্রিষ্টধর্মের বিকৃতি, চার্চের শোষণ, মধ্যযুগের অন্ধকার, নারীর প্রতি অমানবিক আচরণ এসব মিলেই ইউরোপে "নারীর বিদ্রোহ" একসময় স্বাভাবিক পরিণতি ছিল।সেটা makes sense.

কিন্তু যা কখনোই make sense করে না, তা হলো একজন মুসলিমাহ কীভাবে ফেমিনিজমের পতাকা হাতে তুলতে পারেন?

কারণ তার ধর্ম তাকে অবমূল্যায়ন করেনি বরং পৃথিবীর বুকে প্রথমবারের মতো পূর্ণ মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান দিয়েছে।

🌙 ইসলামের আগমনের আগে আরব: এক অন্ধকার গহ্বর: যে বর্বর সমাজে-

◦ জীবিত মেয়েশিশুকে কবর দেওয়া হতো

◦ নারী মানে ছিলো কেবল ভোগ ও বাণিজ্যের বস্তু

◦ স্বামী তার স্ত্রীকে ধনী পুরুষের শয্যায় পাঠানোকে "সম্মানের কাজ" ভাবত

◦ মেয়ে জন্মানো মানে ছিলো শোক

সেই সমাজেই ইসলাম এসে বললঃ

"যার তিনটি কন্যা আছে এবং সে ধৈর্যসহকারে তাদের লালন-পালন করে, তাদের দেখাশোনা করে, খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করে, তাদের প্রতি সদাচরণ করে কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে থাকবে (এখানে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দুই আঙুল পাশাপাশি রেখে নৈকট্য বোঝালেন)।" ~তিরমিজি ১৯১৪

যে সমাজে হাতে গোনা মানুষ পড়তে জানত, সেখানে নবী ﷺ নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষার আয়োজন করলেন।

যে পুরুষ আগে নিজের কন্যাকে মেরে ফেলত, সে-ই ইসলাম গ্রহণের পর কন্যাকে লালনপালনে জান্নাতের সুসংবাদ পেল।

পশ্চিমের নারীরা নিজেদের ধর্মের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু মুসলিম নারীরা? তাদের দ্বীন তাদের উন্নত করেছে, শক্তি দিয়েছে, আলো দিয়েছে। তাই মুসলিম সমাজের ইতিহাসে আমরা দেখব নারী শুধু সাধারণ একজন ব্যক্তি নয়, বরং মহান আলিমা, ফকিহা, মুহাদ্দিসা, শিক্ষিকা, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী। **এরা সেই নারীরা, যাদের নাম ফেমিনিস্টরা ভুলেও উচ্চারণ করে না কারণ তাদের অস্তিত্বই ফেমিনিস্ট ন্যারেটিভ ধ্বংস করে দেয়**।কারণ তারা প্রমাণ যে ইসলাম নারীকে অসম্ভব উচ্চতায় তুলে ধরেছে। চলুন দেখে নিই ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকা কিছু মহীয়সী নারীকে:

১)উম্মুল মুমিনাহ আয়েশা (রা.): তিনি হলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী স্কলার। তিনি শিখিছেন সরাসরি নবী ﷺ থেকে। বর্ণনা করেছেন ২২০০+ হাদিস।তার ঘর ছিল সারা উম্মাহর বিশ্ববিদ্যালয়। বড় বড় সাহাবা যেমন উমর(রা.) , উসমান(রা.), আবু হুরায়রা(রা.) সবাই তার

কাছ থেকে হাদিস অধ্যায়ণ করতেন। তিনি ফিকহ, চিকিৎসাবিদ্যা, কবিতা, আরবি ভাষা, উত্তরাধিকার আইন সবকিছুর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইবনে কাইয়্যুম (রাহ.)বলেন:"**উম্মতের অর্ধেক বিধান আয়েশা(রা.)-এর বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়।**"

আল-যাহাবি (রাহ.) বলেন: "**আয়েশা (রা.)-এর মতো আলিমা নারী এই উম্মতে আর জন্মায়নি**।"

২)**উম্মে সালামাহ (রা.)**: তিনি ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা।তার ঘর ছিল জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র।তিনি ৩৮০+ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নবী ﷺ তাঁর মতামত অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা ছিল ঐতিহাসিক।

৩) **হাফসা বিনতে উমর (রা.)**: তিনি ছিলেন কুরআনের প্রথম রক্ষক। নবী ﷺ নিজের হাতে যে মুসহাফ লিখিয়ে রেখেছিলেন, সেটি হাফসা(রা.)- এর ঘরেই সংরক্ষিত ছিল।উসমান (রা.) সেই মুসহাফ থেকে কপি করে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআন সংকলন করেন অর্থাৎ পুরো উম্মতের কুরআন সংরক্ষণ একজন নারীর তত্ত্বাবধানে ছিল।

৪) **জয়নাব বিনতে আবু সালামাহ (রা.)**: তিনি হলে বিশিষ্ট ফকিহা ও মুআল্লিমা। তিনি ছোটবেলা থেকেই নবী ﷺ-এর ঘরে বড় হয়েছেন। তার থেকে ইমাম হাসান আল-বাসরির শিক্ষকগণ পর্যন্ত ইলম নিয়েছেন।তিনি ফিকহ, হাদিস এবং উত্তরাধিকার আইনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইতিহাসবিদ ইবনে সাদ (রাহ.)লিখেছেন: "**তার ঘর ছিল ফিকহ শেখার অন্যতম কেন্দ্র।**"

৫)**খায়রা উম্মুল বানিন(রাহ.)**: তিনি ছিলেন ইমাম হাসান আল-বাসরির শিক্ষক। তিনি ছিলেন উম্মে সালামাহর দাসী এবং একজন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ফকিহা। ইমাম হাসান আল-বাসরির পুরো শৈশবের শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। তিনি দশের অধিক খ্যাতনামা তাবেঈনের শিক্ষক ছিলেন।

৬)**ফাতিমা বিনতে আলাউদ্দিন সমরকন্দি**: তিনি হলেন এমন এক নারী ফকিহা যিনি নিজের স্বামীকে ফিকহ শিখাতেন। তাঁর বাবা আলাউদ্দিন সমরকন্দি ছিলেন তুহফাতুল ফুকাহার(বিখ্যাত হানাফি ফিকহ গ্রন্থ) লেখক।ফাতিমা পুরো গ্রন্থ মুখস্থ করেছিলেন। তার কাছে শিখতেন বহু ছাত্র এমনকি নিজের স্বামী আলা আদ-দীন কাসানি। হ্যাঁ, তিনি ছিলেন স্বামীর শিক্ষক।এটা ফেমিনিজম না, এটা ইসলামিজম।

৭)**উম্মে ঈসা বিনতে ইব্রাহিম বাগদাদিয়া** :তিনি ছিলেন মুহাদ্দিসা, শিক্ষিকা এবং বাগদাদের অন্যতম জ্ঞানপীঠের নারী মাথা।তার কাছে পড়তেন বড় বড় আলিম।তার ইসনাদ এত শক্তিশালী ছিল যে তাঁর বর্ণনা অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা পেত।

৮)**আজীবাহ বিনতে মুহাম্মদ বাগদাদিয়া** :তিনি নিজের শায়খদের আলোচনা ও তাদরিস নিয়ে ১০ খণ্ড বই লিখেছেন। সেই সময় নারীদের তো দূরের কথা, পুরুষদের ক্ষেত্রেও এত বিস্তারিত ও গবেষণাধর্মী লেখা প্রচলিত ছিল না। তিনি বহু মাদ্রাসায় পড়াতেন এবং অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী তাঁর ইসনাদ পেয়েছেন।

এখন বড় প্রশ্নটা আসুক: ফেমিনিস্টরা এদের কথা বলে না কেন? কারণ এই নারীরা প্রমাণ করে ইসলাম নারীর স্বপ্ন সীমিত করেনি। ইসলাম নারীর সম্ভাবনাকে মুক্ত করেছে।

যেখানে ইউরোপে-

◦ নারী ছিল অশুভ চিহ্ন

◦ চার্চ বলত নারী হলো “entry point of Satan”

◦ হাজার হাজার নারীকে স্টেক-এ পুড়ানো হতো

◦ শিক্ষা ছিল নিষিদ্ধ

◦ সম্পত্তির অধিকার ছিল শূন্য

সেই একই যুগে মুসলিম নারীরা-

◦ মাদ্রাসা পরিচালনা করেছেন

◦ বই লিখেছেন

◦ পুরুষদের শিক্ষক হয়েছেন

◦ গবেষণা করেছেন

◦ আইনি মতামত দিয়েছেন

◦ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাব রেখেছেন

◦ ইসলামি ইতিহাসের intellectual backbone ছিলেন

এই বৈপরীত্য ফেমিনিস্ট ন্যারাটিভকে ধ্বংস করে কারণ ফেমিনিজম দাবি করে 'পুরুষতন্ত্র নারীদের অবহেলা করে'। আর ইসলামিক ইতিহাস বলে 'আল্লাহর বিধান মেনে চলা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ছিল জ্ঞান, মর্যাদা ও আলো'।

এই নারীরা কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না।তারা ছিলেন সেই আলোকবর্তিকা, যাদের আলোয় মুসলিম সভ্যতা দাঁড়িয়ে ছিল।

অথচ পশ্চিমের দৃশ্য তার বিপরীত। অবহেলা, চার্চের অন্ধকার, এবং ধারাবাহিক নির্যাতন নারীদের এমন এক অবস্থায় নিয়ে গেছে যেখানে তাদের লড়াই ছাড়া কোনো পথ খোলা ছিল না।

তারা বিদ্রোহ করেছে এটা স্বাভাবিকই ছিল।কিন্তু মুসলিম নারীর গল্প আলাদা।

তার ধর্ম তাকে অবহেলা করেনি, বরং উঁচু করেছে।

তার সমাজ তাকে শেকল পরায়নি, বরং মুকুট পরিয়েছে।তবু ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে ভুল ব্যাখ্যার কারণে আজ অনেক মুসলিমাহও সেই পশ্চিমা আন্দোলনের পেছনে ছুটতে চায় যেটা মূলত পশ্চিমের যন্ত্রণার উত্তর, ইসলামের নয়।

অধ্যায় ৪: সমাজে ফেমিনিজমের প্রভাব

১.সামাজিক অশান্তি ও পারিবারিক সম্পর্কে বন্ধনহীনতা

ফেমিনিজম যখন নারীর আওয়াজ তুলে দেয়, স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের কথা বলে, তখন অনেক সময় আমরা তার অন্ধ দিকটা ভেঙে দেখতে ভুলে যাই যে পোস্ট-ফেমিনিস্ট সমাজের বাস্তবতা যতটা চকচকে দেখানো হয়, বাস্তবে তা সত্য নয়। অনেক নারীর ক্ষেত্রে সুযোগ এবং অধিকার বাড়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও বাস্তবে তার উল্টো চিত্র দেখা যায়।

প্রথমেই দেখা যাক, কেন একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে সুযোগের মাঝে। বর্তমান সময়ে সাম্প্রতিক এক বিশেষ গবেষণা আমাদের একটি অতিরিক্ত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের সহকারী প্রফেসর **ক্যাথরিন বি. কফম্যান** ও **ক্রিস্টিন এল. এক্সলি** এবং তাদের সহযোগীদের এক অধ্যয়ন 'When Gender Discrimination Is Not About Gender' (পরবর্তীতে প্রকাশিত রূপে The Role of Beliefs in Driving Gender Discrimination) দেখায় যে, অনেক সময় যেই "লিঙ্গভেদ" বলে ধারণা করা হয় তা আসলে গ্রুপ-গড় কর্মদক্ষতার বিশ্বাস (statistical discrimination) থেকে উৎপন্ন হয়। তারা পরীক্ষায় দেখেছেন যে নিয়োগকারীরা পুরুষ-তুল্য কাজের জন্য পুরুষ প্রার্থীদের পছন্দ করছেন, কারণ তারা ধারণা করেন পুরুষেরা গড়ভাবে সেই কাজ ভালো করবে এবং এই পক্ষপাত শুধু লিঙ্গ-ভীতি (bias) থেকে নয়, বরং গভীরভাবে আস্থাভাজন "গোষ্ঠী পারফরম্যান্স"-বিশ্বাস থেকে। আরো দেখা যায় যে, মাত্র *৪.২%* CEO হলেন নারী, এবং *১৯.২%* বোর্ড-মেম্বার নারী। যা প্রমাণ করে যে ক্ষমতায়ন ও কর্মক্ষেত্রে সফলতার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। মাত্র দক্ষতা বা উচ্চ শিক্ষার ভিত্তিতে নারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছায় না।

এই পার্থক্য কেন এত বিশাল? **যে সমাজ বলে দিচ্ছে 'নারী-পুরুষে ভেদাভেদ নেই' ওই একই সমাজ discrimination কেন করছে?** কারণ ফেমিনিজম মুখ দিয়ে অনেক দাবি করলেও, বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ।ফেমিনিজম বলবে: "তুমি স্বাধীন হও, অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াও।" কিন্তু সেই স্বাধীনতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে একটি প্রশ্ন: তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত? তোমার জন্য পারিবারিক যোগাযোগ, মায়ের ভূমিকা, এবং নারীত্বের অনুভব কি বাঁচিয়ে রেখেছ?

আসুন, কিছু দুঃসাহসিক ঘটনামূলক গবেষণা দেখি যা ফেমিনিজমের গ্লামারড চিত্রকে সরিয়ে একটি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়।

১)যৌন সহিংসতা ও নিরাপদ না-থাকা (পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যান): **১৯৮৭** সালে ডঃ মেরি কস (Mary Koss) প্রখ্যাত একটি পরীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন কলেজ-কিশোরী নারীদের মধ্যে যৌন নিপীড়নের প্রকৃতি বোঝার জন্য। তারা মোট ৩,১৮৭ জন কলেজ নারী-কে ইন্টারভিউ করেছিলেন। ফলাফল ছিল ভয়ঙ্কর: ১৫.৪% জানিয়েছেন তাদের ধর্ষণ হয়েছে, এবং আরও ১২.১% বলেছিলেন তারা রেপ চেষ্টা (attempted rape)-এর শিকার হয়েছিলেন।

সমীক্ষায় পাওয়া গিয়েছে, ৮৪% নারীদের ধর্ষণ পরিচিতদের দ্বারা হয়েছে এবং শুধুমাত্র ২৭% নারী নিজেকে "রেপের শিকার" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, অর্থাৎ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নারী যিনি রেপ বা রেপ-চেষ্টার শিকার হয়েছেন, তিনি নিজে সেটির শিকার বলে স্বীকার করেননি। এখানেই ফেমিনিজমের একটি গভীর ত্রুটি প্রকাশ পায়। যদি অনেক নারী এমন নিপীড়ন অভিজ্ঞতা পায়, যেগুলো তারা স্বীকার পর্যন্ত করতে ভয় পান বা স্বীকৃতি পায় না, তাহলে "অধিকার" বা "সমান নিরাপত্তা" কাহিনীই ভুয়া বৈ কিছু না! **যেখানে অনেকেই বলছে তারা নিরাপদ নয় সেখানে অধিকারের আন্দোলন শুধু অধিকারকে উচ্চারন করে** এবং নিরাপত্তা, পারিবারিক বন্ধন ও সহানুভূতির অভাবকে প্রায় আড়াল করে দেয়।

আরেকটি সাম্প্রতিক গবেষণা ,*২০১৮* সালে **রবারিন হিটারসলি-গ্রের** বিশ্লেষণ দেখিয়েছে, কলেজ জীবনে প্রায় ২০-২৫% নারী যৌন নিপীড়নের (rape বা attempted rape) শিকার হয়। তার মধ্যে ৮৪% নিজ কেম্পাসে প্রথম চার সেমিস্টারের মধ্যেই যৌন হয়রানির শিকার হোন। এবং আশ্চর্যের বিষয়: ৩৮% নারী ইতিমধ্যেই কলেজ যাওয়ার আগে (স্কুল বা হাই স্কুলে) তাদের জীবনে প্রথম এমন ঘটনা অনুভব করেছিলেন।

এই পরিসংখ্যান শুধু রূপকথা বা সম্ভাবনা নয় বরং এটি একটি সামাজিক সংকেত। ফেমিনিজম যখন "সমান অধিকার, কাজ, ক্যারিয়ার" চায়, তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গা অনেক সময় এ ভয়াবহ বাস্তবতাকে নজির-বিহীন সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে না।

ফেমিনিজম প্রায়শই সাংগঠনিক কষ্ট এবং পারিবারিক কাঠামোর ভারসাম্যকে উপেক্ষা করে। অধিকার চাওয়ার কথা বলা হয়, কিন্তু নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করার দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা খুব কম হয়।

২)বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপট: লাতিন আমেরিকার সহিংসতা ও দাসত্ব: এখন সামান্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এক বাস্তবতা। ফেমিনিজম যখন "নারীর ক্ষমতায়ন" চায়, সেই একই সময়ে পুরো বিশ্বব্যাপী নারীরা এমন অত্যাচারের মুখোমুখি হচ্ছেন যা ক্যারিয়ার-স্বাধীনতার কাহিনী দিয়ে সমাধান করা যায় না। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটে, সমস্যা যেভাবে সিস্টেমিক এবং ভয়ানক তা অনেকে বুঝতে চান না।

একটি বিশ্লেষণ অনুযায়ী, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান এলাকা এমন একটি ভৌগলিক অঞ্চল যেখানে নারী এবং শিশুদের প্রতি সহিংসতা অত্যন্ত প্রবল। অনেক শিশু (০–১৭ বছর বয়সী) শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। *২০১৭* সালের ইউনাইটেড নেশনসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অঞ্চলটি শান্তিকালেও নারীর জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। ২০২৪ সালের কলম্বিয়ার তথ্য অনুসারে, ১২–১৭ বছর বয়সী কিশোরীদের পাচারের ঘটনা ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। Guatemala-তে যৌন শোষণ থেকে অবৈধ আয়ের পরিমাণ বছরে প্রায় $1.6 বিলিয়ন। এই প্রমাণগুলি দেখায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও নারীরা এখনো নিরাপদ জীবন, পরিবার এবং সম্মান-এর জন্য লড়াই করছেন।

তবে শুধু নির্যাতনই নয় — মানবপাচার ও যৌন দাসত্বও ছড়িয়ে রয়েছে। NCJRS-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক শোষণ এমন এক চক্র তৈরি করেছে যেখানে বহু শিশু এবং নারী পাচার করা হচ্ছে যৌন শোষণের জন্য। অর্থাৎ, "সামাজিক ক্ষমতায়ন" বা "আর্থিক স্বাধীনতা" কথাটা মাত্র একটি দৃষ্টিকোণ মাত্র: প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, অনেক নারী এখনও নিরাপদ বাড়ি, সুরক্ষা, পরিবার এবং সম্মানজনক পরিবেশ-এর দাবিতে জীবন যাপন করছে।

৩)শূণ্যতা: এই সীমাবদ্ধতা শুধু কর্মক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবার, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং মাতৃত্বের সুযোগও প্রায়শই এই কাঠামোগত সমস্যার শিকার হয়। এখানে একটি বাস্তব জীবনের গল্প যুক্ত করা যায়। ৫৯ বছর বয়সী এক স্বনির্ভর মিলিয়নিয়ার নারী যিনি রিয়েল এস্টেট এবং রেস্তোরাঁ ব্যবসায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার এক সাক্ষাৎকারে তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বীকার করেছিলেন: "That I never became a mother."

তিনি সবকিছু অর্জন করেছেন -সম্পদ, সাফল্য, স্বাধীনতা। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে প্রাকৃতিক এবং সৌন্দর্যময় অংশ, মাতৃত্ব, আর তিনি উপভোগ করতে পারলেন না। ফেমিনিজমের আদর্শ তাকে শিখিয়েছিল, ক্যারিয়ার এবং স্বাধীনতা সব, কিন্তু প্রকৃত জীবনের সমৃদ্ধি ও সম্পর্কের গভীরতা হারিয়ে আজ তিনি একাকিত্বের কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছেন।

এখানেই আমরা একটি বড় স্রোত দেখতে পাই: ফেমিনিজম পরিবারিক বন্ধন, নিরাপত্তা এবং নারীত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে ব্যর্থ। তাদের 'সমতা'-র বুলি কাল্পনিক ও অবাস্তব। কেননা সত্যিকার ক্ষমতায়ন হল এমন একটি সমাজ যেখানে নারীরা শক্তিশালী ও স্বাধীন হওয়ার পাশাপাশি নিরাপদ, সুরক্ষিত, এবং ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্কের অংশীদার হতে পারে। ফেমিনিজমের বর্তমান বাস্তবতা সেই চাহিদাকে পুরোপুরি পূরণ করছে না, এবং এই ব্যর্থতা থেকে সামাজিক অশান্তি, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, এবং মানসিক চাপ জন্ম নিচ্ছে।

২.অধিকার বনাম দায়িত্ব

আধুনিক সমাজে নারীর অধিকার নিয়ে প্রচার প্রচণ্ড, কিন্তু সেই প্রচারের মাঝে আমরা প্রায়শই দায়িত্বের গুরুত্ব ভুলে যাই। নারী শিক্ষিত হচ্ছে, স্বাধীন হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু এই অধিকার-লিপ্সার পথে ঘর-বাড়ি, সন্তান, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন - সবই প্রায় উপেক্ষিত হয়ে যায়।

লরা ডয়েলের **The Surrendered Wife** এ এক স্পষ্ট উদাহরণ আছে। তিনি দেখান, যখন নারী তার স্বামী এবং পরিবারের প্রতি নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়, তখন সম্পর্কের গভীরতা এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পশ্চিমা ফেমিনিজম বারবার বলে, "নিজেকে প্রথমে ক্ষমতায়ন করো; দায়িত্ব পরে।" ফলে আমরা আধুনিক নারীদের জীবনে দেখতে পাই অধিকার অর্জিত, কিন্তু দায়িত্ব উপেক্ষিত।

একটি বাস্তব উদাহরণ: মার্কিন লেখক **Susan Patton,** যিনি কলেজ জীবনে নিজের ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তীতে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন: “College women need to realize the clock is ticking... don’t miss the chance for family.”
এই মন্তব্য প্রকাশ করে যে, আধুনিক শিক্ষিত নারী কর্মজীবনের প্রতি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে পরিবার এবং সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে না।
পশ্চিমা ফেমিনিজম নারীর স্বাধীনতা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর জোর দেয়। কিন্তু এই আদর্শ বাস্তবে অনেক নারীর জীবনের মানসিক চাপ এবং একাকীত্ব বৃদ্ধি করেছে। তারা সফল হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল হয়েছে, কিন্তু সম্পর্ক, পরিবার এবং মাতৃত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। লরা ডয়েলের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন,
“A surrendered wife discovers fulfillment in letting go of control, not by fighting for it everywhere else.” (একজন আত্মসমর্পিত স্ত্রী পূর্ণতা খুঁজে পান তখনই যখন তিনি নিয়ন্ত্রণ ছাড়েন, অন্য সব জায়গায় সেটার জন্য লড়াই করার চেষ্টা না করে)।
এখানে দেখা যায়, যে নারীরা অধিকার খুঁজে বের করার পথে ছুটে চলেছেন, তারা প্রায়ই পারিবারিক দায়িত্বকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। শুধু অধিকার বা ক্যারিয়ার অর্জন করে নারীর জীবন সম্পূর্ণ হয় না। নিরাপত্তা, সম্পর্ক এবং পরিবারিক বন্ধন এসব দায়িত্বকে ভুলে গেলে জীবন একঘেয়ে এবং মানসিকভাবে অস্থির হয়ে যায়। নারীরা যেসব সুযোগের জন্য লড়ছেন: উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, ক্যারিয়ার, স্বাধীনতা তাতে ঘর, সন্তান, মাতৃত্ব প্রায়শই পিছিয়ে যায়। ফেমিনিজমের শিক্ষা বারবার বলে, “নিজের অধিকারকে সর্বোচ্চে রাখো”, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই শিক্ষার ফলে নারীরা দুটি স্বপ্নের মধ্যে একটিকে হারাচ্ছেন।

- একপাশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ক্যারিয়ার,
- অন্যপাশে পরিবার, সন্তান, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক,

প্রায়শই দেখা যায়, আধুনিক নারীরা ক্যারিয়ারকে বেছে নিচ্ছেন এবং পারিবারিক দায়িত্ব পিছিয়ে ফেলছেন।লরা ডয়েল এবং Susan Patton-এ আমরা দেখতে পাই, অনেক নারীর একাকীত্ব ও মানসিক শূন্যতা ঠিক এখান থেকেই শুরু। ফেমিনিজমের প্রচারিত গল্প - স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন, নিজের স্বপ্ন পূরণ- এখানে পুরোপুরি সত্যি নয়। কারণ, দায়িত্বের ভারসাম্য ছাড়া অধিকার অসম্পূর্ণ।

৩.পুরুষ বনাম মহিলা: প্রতিযোগিতা নাকি পরিপূরকতা

Merriam Webster-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ‘পিতৃতন্ত্র হলো সামাজিক কাঠামো যেখানে পুরুষ প্রধান ভূমিকা পালন করে পরিবার ও সমাজে।’ অনেকেই এই শব্দকে ভুলভাবে নারীর দমন বা ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, প্যাট্রিয়ার্কি কখনো নারীর অধিকারকে হ্রাস করার জন্য তৈরি হয়নি। বরং এটি ছিল সমাজ ও পরিবারকে সমন্বিত এবং স্থিতিশীল রাখার কাঠামো।

ফেমিনিস্ট আন্দোলন বিখ্যাত হওয়ার পর তাদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় বিবাহ ও পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লড়াই। বিখ্যাত নারীবাদী লেখিকা ও প্রভাষক **লিন্ডা গর্ডনের** বিখ্যাত মন্তব্য হলো,

'একক পরিবার ব্যবস্থা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। এর চূড়ান্ত মর্মার্থ যা-ই হোক না কেন, পারিবারিক বিচ্ছেদ বর্তমানে একটি বাস্তব বৈপ্লবিক পদ্ধতি। বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো নারীরই উচিত নয় নিজের কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা ক্ষতিগ্রস্থ করা।'

আরেকজন লেখিকা **ভিভিয়ান গর্নিকের** ভাষ্যমতে, গৃহিণী একটি অবৈধ পেশা।

পশ্চিমা সমাজে ফেমিনিজমের উত্থান প্রায়ই পরিবারকে অগ্রাহ্য করেছে, এবং এই প্রবণতা বহু নারীর জীবনে ব্যক্তিগত শূন্যতা ও হতাশার কারণ হয়েছে। **Mary Wollstonecraft**, যিনি নারীর স্বাধীনতার অন্যতম প্রচারক ছিলেন, নিজ জীবনের শেষ পর্যায়ে লিখেছেন যে সামাজিক সংগ্রাম ও স্বাধীনতার প্রতি মনোনিবেশ তার পারিবারিক সম্পর্ক ও আবেগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তার কন্যা **Mary Shelley** পরে উল্লেখ করেছেন,

"আমার মা যা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার ফাঁক আমাদের পরিবারে ছাপ ফেলেছিল।"

Elizabeth Cady Stanton, একজন বিখ্যাত suffragist, পরবর্তীতে লিখেছেন যেতার সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম প্রায়শই পারিবারিক সম্পর্কের উপেক্ষা এবং ব্যক্তিগত আনন্দের ক্ষতি এনেছে। একইভাবে, **Simone de Beauvoir**-এর memoir-এ প্রকাশ, যে উচ্চ শিক্ষাগত ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই কখনো কখনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং আবেগীয় পরিপূর্ণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, শুধু অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য পরিবার ও সম্পর্ককে উপেক্ষা করা দীর্ঘমেয়াদে মানসিক এবং সামাজিক ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

OECD-এর ২০১৯ সালের পারিবারিক গবেষণায় দেখা যায়, দ্বি-আয় পরিবারের নারীরা কর্মজীবন এবং গৃহকর্তৃত্বের ভারসাম্য বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। সংসার ও ক্যারিয়ারের ভারসাম্যহীনতা মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে এবং সম্পর্কের মানকে কমাচ্ছে।শুধু গবেষণা নয়, বাস্তব জীবনও প্রমাণ দেয়। **US Census Bureau**-এর ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৬৭% ডিভোর্সের প্রক্রিয়া নারীদের দ্বারা শুরু হয়। ডিভোর্সের বর্তমান পরিস্থিতিও এই যুক্তিকে সমর্থন করে। "**How Couples Meet and Stay Together**" রিসার্চে দেখা যায়, ডিভোর্সের ৬৯% ক্ষেত্রে মূলত নারী দায়ী। আধুনিক অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতি অতি মনোযোগ প্রায়ই সম্পর্ক ও পরিবারকে দুর্বল করে দেয়।এই বাস্তবতা প্রমাণ করে, অধিকারের দাবির সঙ্গে দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখা না হলে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষদের নারীর রক্ষা করা কোনো কর্তৃত্বের প্রতীক নয়, বরং এক মহান দায়িত্বের নিদর্শন। আল্লাহ বলেন,

“পুরুষরা নারীদের রক্ষক কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের চেয়ে কিছু অগ্রাধিকারের মাধ্যমে প্রভূত করেছেন এবং তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করতে দিয়েছেন।”
~সূরা আন-নিসা (৪:৩৪)

ইসলাম পুরুষকে রক্ষক করেছে কারণ রক্ষকের কাঁধে বোঝা থাকে, সুবিধা নয়।
১)আর্থিক দ্বায়িত্ব: আল্লাহ পুরুষদের কিছু কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন।নারীর খরচ, সন্তানের খরচ, পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব ১০০% পুরুষের ওপর।(আর্থিক দ্বায়িত্ব)।রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণকারী, এবং তার কাছ থেকে তার পরিবারের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে।”~ (সহীহ বুখারি, হাদীস ৮৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮২৯)
২)শারীরিক সুরক্ষার দায়িত্ব: বিপদ-আপদ, যুদ্ধ, নিরাপত্তা সংকট- এসবের frontline duty পুরুষদের। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করব না?” রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন:
"তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো- হজে মাবরূর।"~(সহীহ বুখারি, হাদীস ১৫২০)
৩)পরিবারের সম্মান রক্ষা: কেউ যদি পরিবারকে আঘাত করে, প্রতিরোধ করার দায়িত্ব পুরুষের। রাসুল ﷺ বলেছেন:
“যে ব্যক্তি নিজের দায়িত্বে থাকা মানুষদের (পরিবারকে) নষ্ট হতে দেয়, সে পাপী।” ~সুনান আবি দাউদ, হাদীস ১৬৯২
রাসুল ﷺ আরো বলেন:
“ফিতনার সময় যে ব্যক্তি তার পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে সে শহীদ।”
রক্ষক মানে নারীর ওপর “control” নয়। বরং নারীর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব।ইসলামের কাঠামো এমনভাবে গড়া যেখানে পুরুষ দায়িত্ব নেবে, নারী সুরক্ষিত থাকবে এবং এই সুরক্ষা নারীর ব্যক্তিগত সম্ভাবনা, শিক্ষা, ক্ষমতা সবকিছু প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করবে।
অতএব, প্যাট্রিয়ার্কি কখনো নারীর দমন বা অবমূল্যায়নের প্রতীক নয়। আধুনিক ফেমিনিজমের কিছু আদর্শ যেমন পরিবার ভাঙা, ব্যক্তিগত অধিকারকে সবকিছুর উপরে প্রাধান্য দেওয়া - দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্ক, মাতৃত্ব এবং মানসিক ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাস্তব জীবন, গবেষণা এবং ইতিহাস প্রমাণ করে যে, পুরুষ এবং নারীর পরিপূরক ভূমিকা বোঝা এবং ভারসাম্য বজায় রাখা একমাত্র কার্যকর উপায়, যা নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনকে পূর্ণ এবং স্থিতিশীল করে।

অধ্যায় ৫: ইসলামের আলোকে নারী, পরিবার ও সমাজ

১.মানুষের সৃষ্টির নকশা

মানুষের সৃষ্টি নিয়ে কুরআন যখন কথা বলে, তখন ভাষাটা কখনো শুধু আইনগত নয়, কখনো শুধু আধ্যাত্মিকও নয় বরং এমন এক মহাজাগতিক অন্তর্দৃষ্টি, যা আমাদের অস্তিত্বকে অন্যরকম আলোর নিচে দাঁড় করিয়ে দেয়।

আমরা কারা, কেন সৃষ্টি হয়েছি, নারী-পুরুষ হয়ে কেন বিভক্ত হয়েছি - এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআন এমনভাবে দেয়, যেন আপনি নিজের ভেতরের মাটিকে নতুন করে চিনে ফেলেন। আল্লাহ বলেন,

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একক নফস থেকে, আর সেখান থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জৌলী (জোড়া)।"~ সূরা আন-নিসা ৪:১

এ আয়াতটি ইসলামী ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে একটি মৌলিক সত্য ঘোষণা করে আসছে যে নারী–পুরুষের উৎস এক। মর্যাদা এক। মানবত্ব এক। **ইবনে কাসির** তাঁর তাফসিরে বলেন: **"এক নফস বলতে এখানে আদম (আ.) আর তাঁর থেকে সৃষ্টি হাওয়া (আ.)। উদ্দেশ্য ছিল মানবসমাজকে জোড়ায় জোড়ায় স্থাপন করা**।"

অর্থাৎ, উদ্দেশ্য হলো জোড়া, দ্বিরূপ, পরস্পর - সম্পূরকতা। মানুষ একা সম্পূর্ণ নয়। এই সত্যটি মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষা।ইসলাম বলে, দুই লিঙ্গ ভিন্ন, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন।আর একই উদ্দেশ্য না হলে, একই নকশাও হয় না।এই বিষয়টি কুরআন গভীরভাবে স্পর্শ করেছে:

"এবং আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি-কাজে সবচেয়ে ভালো জানেন।"~ সূরা মু'মিনুন ২৩:১৪

আমরা যেভাবে পৃথিবীকে দেখি, তা আমাদের সীমিত দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে।কিন্তু যেভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে গভীর কারিগরী দক্ষতা।

পুরুষের শারীরিক নকশা: বড় হাড়, বেশি পেশী, ঝুঁকি গ্রহণের মানসিক সক্ষমতা, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা,বাইরের দুনিয়ার চাপ সামলানোর স্নায়বিক সামর্থ্য ইত্যাদি।

নারীর নকশা: মেরুদণ্ডের S-আকৃতি গর্ভধারণের জন্য বিশেষভাবে নকশা করা, ব্যথা-সহ্যক্ষমতা, অক্সিটোসিন–প্রধান (স্নেহ ও লালন-পালনের হরমোন), আবেগ–অনুভূতির দ্রুত বোঝা, সহানুভূতির বেঁচে থাকার কৌশল ইত্যাদি।

এই দুই নকশা একই কাজের জন্য নয় বরং একই জীবনকে দুই ভিন্ন দিক থেকে শক্তিশালী করার জন্য।আল্লাহ আরো বলেন,

"তিনিই তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও।"~সূরা আর-রূম ৩০:২১

এই আয়াতটি একটি সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছে। জীবনসঙ্গীর সাথে মন শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি লাভ মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা।পুরুষ শান্তি পায় নারীর ভেতরে আর নারী শান্তি পায় পুরুষের নিরাপত্তায়।

নারীদের সম্মাননার আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণীয় নিদর্শন পাওয়া যায় হাওয়া (আ.)-এর গল্পে।খ্রিস্টান মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল যে নারীই দোষী, কারণ হাওয়া-ই আদমকে ভুল করিয়েছিলেন।কিন্তু কুরআন এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছিল।আল্লাহ বলেন,

“**শয়তান তাদের দু’জনকে পা পিছলে দিল**।” ~(সূরা বাকারা ২:৩৬)

এখানে কোনো দোষারোপের লুকোচুরি নেই।নারীকে অপমান করার কোনো ইঙ্গিত নেই। বরং তার উল্টো! **তাবারী** লিখেছেন, “কুরআন আদম–হাওয়াকে সমানভাবে দায়ী করে পুরুষতান্ত্রিক অপমানের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।”এটা ছিল নারীর মর্যাদা পুনর্বাসনের প্রথম বিপ্লব।

আল্লাহ পুরুষের নারীদের উপর কর্তৃত্ব দিয়ে বলেন,

“**পুরুষ নারীর অভিভাবক। কারণ আল্লাহ তাদের একাংশকে অন্যাংশের ওপর শ্রেষ্ঠতা দিয়েছেন এবং কারণ তারা ব্যয় বহন করে**।” ~(সূরা আন-নিসা ৪:৩৪)

এ আয়াতটি বিভ্রান্তিকর হয় শুধু তখনই যখন “শ্রেষ্ঠতা” শব্দটিকে আধুনিক রাজনীতির লেন্স দিয়ে দেখা হয়। এ শ্রেষ্ঠতা ক্ষমতার নয়, বরং দায়িত্বের।যুদ্ধের দায়িত্ব, উপার্জনের দায়িত্ব, নিরাপত্তার দায়িত্ব, পরিবারের বিপদের সামনে দাঁড়ানোর দায়িত্ব। এই আয়াত নারীর মুক্তি ঘোষণা করছে। বলে দিচ্ছে : তোমার ওপর কোনো আর্থিক বোঝা নেই।তোমার ওপর কোনো যুদ্ধ নেই।তোমার ওপর পরিবারের খরচ নেই। তোমার ওপর রাতে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব নেই।তোমার দায়িত্ব অন্যদিকে। নরমতা, স্নেহ, পরিবারকে গড়ে তোলা, সাংগঠনিক স্থিতি। দুই দায়িত্ব দুই দিকে।অথচ মর্যাদা সমান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনে আমরা অনেক চিন্তাজাগানো দৃশ্য দেখি। ওহির প্রথম রাতে রাসুল ﷺ যখন কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলেন “জামিলুনি জামিলুনি” , **খাদিজা (রা.)**–এর উত্তর ছিল ইতিহাসের সেরা মানসিক স্বীকৃতি

“**আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না।কারণ আপনি দুর্বলকে সাহায্য করেন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন ও অতিথিকে আপ্যায়ন করেন**।”

একজন নারীর মানসিক শক্তি কীভাবে একজন নবীকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে,তার জ্বলজ্বলে উদাহরণ।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির সংকটময় মুহূর্তে রাসুল ﷺ যখন সাহাবীদের আনুগত্য না দেখে বিষণ্ণ হয়ে ফিরছিলেন,**উম্মে সালামা (রা.)**বলেছিলেন:

“**হে আল্লাহর রাসুল, আপনি নিজে মাথা মুন্ডন শুরু করুন; তারা অনুসরণ করবে**।”

এবং সেটাই ঘটেছিল।এটা আমাদের শেখায় ইসলাম শুরু থেকেই নারীকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে ফারিগ করে নাই। কেনান, নারী-পুরুষ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।এরা কোনো প্রতিযোগীও নয়।এরা হচ্ছেন

দুই নদী, এক সাগর।
দুই আত্মা, এক যাত্রা।
মানুষ কখনো তার ফিতরাহের বিরুদ্ধে গিয়ে শান্তি পায় না।এবং নারী–পুরুষ-দুজনের-ই আল্লাহ যে নকশায় সৃষ্টি করেছেন,সেটাতে-ই তাদের মুক্তি।

২.ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

ইসলামের ইতিহাসে নারী কখনো শুধুই বস্তু বা সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। বরং তিনি ছিলেন সমাজের নৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম রক্ষক।
এক সময় মদিনায় **বনু কাইনুকা** (ইহুদি গোত্র) বাস করত। তাদের মধ্যে ছিল স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র নির্মাতা লোকেরা। এক মুসলিম মহিলা দোকানে স্বর্ণ কিনতে গিয়ে একটি অপমানজনক ঘটনার সম্মুখীন হন। ওই স্বর্ণকার ব্যক্তি তার পোশাকের নিচে চিকনভাবে পেরেক রেখে দেয়, যাতে তার জামাটুকু পিছনে আটকে যায়, এবং যখন মহিলা উঠে দাঁড়ায়, তার জামা ছিঁড়ে পড়ে। তিনি চিৎকার করে উঠলে, এক মুসলিম পথচারী ক্ষোভে সেই স্বর্ণকারকে মারতে মারতে হত্যা করে ফেলেন।মুহুর্তেই ওইখানের উপস্থিত বনু কাইনুকা গোত্রবাসীরা প্রতিশোধপরায়ণতায় ঐ মুসলিমকে বিচার ছাড়াই হত্যা করে। এই ঘটনা নবীজির (ﷺ.)কাছে গেলে তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠেন এবং বনু কাইনুকাকে ১৫ দিনের জন্য অবরোধ করেন। পরিশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে এবং মদিনা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়।
এই ঘটনা শুধু শাস্তি নয়, এই পদক্ষেপ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি একটি স্পষ্ট বার্তা। নারীর মর্যাদা কখনোই অবমূল্যায়ন করা যাবে না। নারীকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা ইসলামের নৈতিক দর্শনের একটি অটুট দৃষ্টান্ত।
এমন আরেকটি ঘটনা দেখা যায় আব্বাসীয় শাসনামলে। **খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ**র শাসনকালের সময়ে,এক মর্মান্তিক খবর তার দরবারে পৌঁছায়। এক মুসলিম নারী বাইজেন্টাইন (রোমান) শহর, অমোরিয়াম-এ, বন্দী ছিলেন।এমনকি স্থানীয় লোকরাও তার প্রতি অত্যাচার করছিলো, এবং জনসমক্ষে তার মর্যাদা লাঞ্ছিত করা হচ্ছিল। একজন মুসলিম, ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে, দৌড়ে খলিফার কাছে এই বার্তা নিয়ে পৌঁছায়। এই খবর শুনে মু'তাসিম রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তারপর তিনি দ্রুত সৈন্য গঠন করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন।ঐতিহাসিকদের মতে মু'তাসিমের শাসনকাল বিতর্কিত ছিল, তবুও তিনি একজন মুসলিম নারীকে রক্ষা করার জন্য তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নেন। এই ঘটনাটি আমাদের দেখায়, নারীর মর্যাদা রক্ষা কেবল ধর্মীয় কর্তব্য নয়, এটি সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায়বিচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
বানি কায়নুকা ও মু'তাসিমের গল্পের মতো ঘটনা শুধু ইতিহাস নয়, বরং নারীর মর্যাদা রক্ষার নৈতিক শিক্ষা। নারীর অধিকার কখনোই আধিপত্য বা ক্ষমতার হাতিয়ার হতে পারে না। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত স্বাধীনতা মানে মর্যাদা, দায়িত্ব এবং সুরক্ষা। নারীর জীবনে

মর্যাদা বজায় রাখার অর্থ হলো সম্মান দেওয়া, নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং আত্মিক পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা।

আজকের সমাজে নারীর স্বাধীনতা প্রায়শই প্রতিযোগিতা, অর্থ বা ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত স্বাধীনতা মানে মর্যাদা, দায়িত্ব এবং সুরক্ষা। নারীর জীবনে মর্যাদা বজায় রাখা মানে সম্মান, নিরাপদ পরিবেশ এবং আত্মিক পূর্ণতা নিশ্চিত করা।

আমার নিজের অভিজ্ঞতাও এই শিক্ষার সঙ্গে মিলে। বহু বছর ধরে যে যন্ত্রণার বোঝা আমি হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেই বেদনাগুলো আজ প্রকাশ করছি। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে সাহায্য করা হচ্ছে, আমাকে সমর্থন করা হচ্ছে, আমাকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, আমাকে সত্যিই মর্যাদাপূর্ণভাবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে, আমি অনুভব করলাম, আমি কেবল আরেকটি বস্তু - একটি ব্যবহার্য ব্যক্তি- যার অনুভূতি ও স্বপ্নকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই উপলব্ধি আমাকে একাকী দাঁড় করিয়েছে, প্রতারিত মনে, হতাশ হৃদয় নিয়ে। প্রতিটি মতাদর্শ, প্রতিটি উৎসাহের বানী যা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আজ তা আমাকে প্রতারণার গভীর ছায়া হিসেবে মনে হয়।

আমি বুঝতে পারি, যা কিছুকে আমি এত দিন বিশ্বাস করেছিলাম আমার স্বপ্ন এবং ইচ্ছার প্রতি সাপোর্ট হিসেবে, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কেবল একটি ধোঁকা। আসলে এটি শুধু আমার আত্মসম্মান এবং আবেগকে অবমূল্যায়ন করার একটি অভিনব উপায় ছিল। এই উপলব্ধি আমাকে এক অদ্ভুত স্থিতিতে দাঁড় করিয়েছে - হৃদয় ভারাক্রান্ত, ও এক আজব অনুভূতি নিয়ে। আমি একবারও ভাবিনি যে পৃথিবীতে এত দীর্ঘ সময় ধরে একটি মিথ্যাচার আমাকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।আর এই ঝলসে যাওয়া হৃদয়কে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে মেরামত করেদেন আর-রাহমান। যার কাছে না চাওয়ার সত্তেও স্নেহময় নির্দেশনার মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেন ইসলামের সাথে।

আমার এই অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে ইসলামের শিক্ষা শুধু ধ্যান বা ইতিহাস নয়, এটি জীবনের গভীর সত্য।, ইসলাম হলো 'দ্বীন'। সহজ ভাষায় দ্বীন হলো এমন এক সিস্টেম যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্রতম বিষয় থেকে নিয়ে দেশ ও জাতি পরিচালনার নীতিও শিখিয়ে দেয়। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা, প্রতিটি উদাহরণ, প্রতিটি ইতিহাসের অংশ এই সত্যকে তুলে ধরে। সর্বশেষে, মনে করিয়ে দিতে চাই ওই রবের কথা যিনি অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বলে দেন,

"নিশ্চয়ই আমি কাছাকাছি আছি। তাই যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি। অতএব তারা আমার ডাক শোনার জন্য ডাকুক, আর বিশ্বাস রাখুক আমার প্রতি।" (সূরা বাকারা ২:১৮৬)

রেফারেন্স

১.অবাধ্যতার ইতিহাস

২.ফেমিনিস্ট প্রোপাগাণ্ডা

৩.ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

৪.মানসাঙ্ক

৫.সারেন্ডার্ড ওয়াইফ